অধ্যায় ৭

দলিত এবং ধর্মের নানা অনিশ্চয়তা

ধর্মনিরপেক্ষমুখী মানুষদের নিকট, ক্ষমতায়নের প্রেক্ষাপটে ধর্ম সম্পর্কে বলাটা উদ্ভট শোনাতে পারে। কিন্তু ঘটনা হল, ক্ষমতায়নের জন্য দলিতদের সংগ্রামের ইতিহাসে, ধর্ম একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই অধ্যায় থেকে আমরা যেমনটি জানব, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলামধর্ম ও শিখধর্ম দলিতদের বিভিন্ন দলের গঠনে অবদান রেখেছে। বাবাসাহেব অম্বেদকর যখন এক বিরাট সংখ্যক মাহারদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এই ঘটনা একটি ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে শুধুমাত্র প্রস্থানই ছিল না যে, ধর্ম তাদের মৌলিক মানব মর্যাদা অস্বীকার করে, কিন্তু এটা আরও ছিল শ্রেণী ইস্যু মোকাবেলা করার একটা প্রচেষ্টা, যে শ্রেণী ইস্যুর উপর মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ কেন্দ্রীভূত ছিল। ধর্ম পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল এটাও নির্দেশ করা যে, দরিদ্র ও নিপীড়িত শ্রেণীদের জন্য সমাজতন্ত্রের ভাবনাগুলো বুদ্ধের ধম্ম (Dhamma of Buddha) অনুসরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব।

দলিত ধর্ম – সমাজের দর্পণ

ধর্ম হচ্ছে, জনসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উপলব্ধি দলিতদের তাদের ধর্মীয় পরিচয় ও পালন পুনঃমূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করেছে। ঐতিহ্যগতভাবে, সমাজে দলিতদের মত, তাদের দেব-দেবীরাও ঐশ শ্রেণীবিন্যাসে একটি প্রান্তিক স্থানের অধিকারী। তাদের দেব-দেবীদের দেখানো হয়েছে কালো বর্ণ এবং অপকারী ও শয়তানী শক্তি হিসেবে, যারা অন্যদের ক্ষতি করে আনন্দ পায় আর তাদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব শুধুমাত্র রক্তাক্ত বলি ও নৈবেদ্য উৎসর্গের মাধ্যমে, অন্যথায় বিশেষ ব্যক্তি বা দলের উপর নেমে আসবে চরম দুর্দশা ও দুর্যোগ। এ দেব-দেবীদের কয়েকজন, যেমন ভাদ্রকালি, প্রাণঘাতী ব্যাধি বয়ে আনে, যেমন কলেরা ও গুটি বসন্ত।

লক্ষ লক্ষ দলিত প্রধানত তাদের প্রাচীনদের ধর্ম নিয়ে বসবাস করছে। তাদের মাতৃদেবী, ব্যধির দেবী, পূর্বপুরুষদের আত্মা, বীর ও বীরঙ্গনা, পাহাড়ি দেবতা, নদীর দেবতা, শুদ্ধিকৃত পশু এবং পবিত্র গাছগাছালি এগুলো ছিল ঐতিহাসিকভাবে তাদের একেবারে নিজস্ব আর এ সকল দেবী-দেবীদের তারা গভীর অনুরাগী। এ সকল দেবতা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়েই তাদের পৌরাণিক অতীত। তারা বোঝে না যে, অতীতে হিন্দু সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা ও অবদমনকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল ধর্মীয় দিক দিয়ে তাদের দেব-দেবীদের গ্রহণ ও আপন করে নেওয়ার মাধ্যমে। তামিল নাড়ুর Parayar, পাঞ্জাবের Chuhra, অথবা মহাষ্ট্রের মাহার যারাই হোক, একটি বিষয় লক্ষণীয় : দলিতদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় একটি নির্দিষ্ট সমধর্মিতা। তাদের দেব-দেবী ও তাদের উপাসনা-পদ্ধতি পরিস্থিতির সঙ্গে এবং আশু বস্তুগত চাহিদা ও দৈহিক অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। দলিত বহুজনদের মতই, তাদের দেব-দেবীরা তাদের উৎপাদনশীল দৈহিক শ্রম প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। অধিকন্তু, দলিতরা তাদের ধর্মানুষ্ঠানে যে সব চিহ্ন ও পদ্ধতি ব্যবহার করে সেগুলোতে রয়েছে তাদের নিয়ে গভীর একাত্মতাবোধ। তাদের ধর্মীয় বিশ্ব লোকধর্মের

বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে।

দলিত ধর্মের প্রকৃতি এবং চিহ্নসমূহ

দলিত ধর্মের প্রকৃতি এবং তাদের ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মীয় পালন একটি স্বতন্ত্র দিকনির্দেশনার অধিকারী। দলিতদের মধ্যে গভীর একাত্মতাবোধের সুবাদে, এটা প্রকাশ পায় যে, তাদের উপাসনার ধরনগুলো উল্লেখযোগ্য সমাজগত চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় তাদের নানা পালা-পার্বণে ও অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে। ড্রামের ব্যবহার, ছন্দোময় নাচ এবং জোরগলায় গান, এগুলো সমগ্র সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণকে প্রবুদ্ধ করে।

সর্বোপরি, বেঁচে থাকার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতা করা সংগ্রামগুলো তাদের ধর্মময়তায় নিবেশিত করেছে, উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীগুলোর মধ্যে লক্ষণীয় ধর্মময়তার বিচ্ছিন্ন নানা ধরনের বিপরীতে জগতের প্রতি গভীর আকর্ষণ। দলিত ধর্মীয় প্রতীকসমূহ প্রকৃতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। এ কথা সত্য যে, উচ্চ বর্ণরাও প্রকৃতি থেকে নেওয়া নানা প্রতীক ব্যবহার করে। কিন্তু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা একটি ভিন্নতা লক্ষ্য করব। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ বর্ণদের ব্যবহৃত প্রতীকগুলো হচ্ছে, পক্ষীকূলের মধ্যে পায়রা, ঈগল, পেলিকন, ময়ূর ইত্যাদি, আর পশুকূলের মধ্যে সিংহ, ঘোড়া, বাঘ ইত্যাদি, যেগুলো প্রকাশ করে ঊর্ধ্বমুখী উড্ডয়ন ভঙ্গী (পায়রা, ঈগল ইত্যাদি) এবং শক্তিমত্তার ভঙ্গী (সিংহ, বাঘ ইত্যাদি)।

মজার বিষয় হল, দলিত জনগণের ব্যবহৃত প্রকৃতি থেকে নেওয়া প্রতীক এবং গাছগাছালি লক্ষণীয়ভাবে ধরিত্রীমুখী, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাপ ও ইঁদুরের কথা, যেগুলো মৃত্তিকার উদরে বাস করে। গ্রাম্য উপাসনায় নিত্যদিনকার বাস্তবতাগুলো দেবত্বের প্রতীক ও চিহ্ন হয়ে ওঠে, যেমন পাথর, জলের পাত্র ইত্যাদি। তাদের ধর্মময়তায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তাদের দেব-দেবীদের জন্য নির্দিষ্ট কোন আবাসস্থল নেই, যে আবাসস্থল–উচ্চ বর্ণগুলোর ধর্মীয় ঐতিহ্যমালায় যেমনটি লক্ষ্য করা যায় সে রকম–ধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা থেকে তাদের রক্ষা করে। জনগণ ও স্থানকে পবিত্রীকরণ করাটা ঈশ্বরের নামে শাসন করার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। পক্ষান্তরে, দলিতদের ধর্মানুষ্ঠান ও উপাসনা পদ্ধতিতে পবিত্রতা সাময়িক এবং স্বল্পকালস্থায়ী। অধিকন্তু, দলিতদের পালা-পার্বণ ও অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপনে রয়েছে একটি বলিষ্ঠ সামাজিক বিষয় আর এগুলো কখনোই নাশকতামূলক বৈশিষ্ট্যের নয়।

এগুলো আমাদের যা বলতে চায় তা হল যে, জীবনের সামাজিক ও বৈষয়িক বাস্তবতাসমূহ এবং দেব-দেবীদের প্রতিমূর্তির ভাব-আরোপ–এ দু'য়ের মধ্যে একটি সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে রয়েছে একটি উপায়, যার সাহায্যে আমরা তাদের দেব-দেবী সংক্রান্ত ধারণায় পার্থক্যটি চিহ্নিত করতে পারি। আলাদা আলাদাভাবে এ সকল পার্থক্য সম্পর্কে বলার পর, পার্থক্যকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন নিম্নোক্ত কথাগুলোয় :

এ সকল দলিতবহুজন দেব/দেবীর প্রতিমূর্তি, ভূমিকা, কাহিনীগুলো কি নির্দেশ করে ? এ সকল দেব/দেবীর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ হিন্দু আধিপত্যময় দেব-দেবীদের থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। দলিতবহুজনদের দেব/দেবীরা সাংস্কৃতিকভাবে উৎপাদনে, রক্ষায় ও প্রজননের সঙ্গে জড়িত। তারা সমাজের এক শ্রেণীর সঙ্গে আর এক শ্রেণীর, এক বর্ণের সঙ্গে আর এক বর্ণের মধ্যে তুলনা করে। এ সকল কাহিনীতে, একটি শত্রু প্রতিমূর্তি সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। দলিতবহুজন সমাজ একটি যাজকীয় শ্রেণী/বর্ণ, যা উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন আর যা দেব-দেবীদের থেকে লোকদের বিচ্ছিন্ন করে, তার কখনো আবির্ভাব ঘটতে দেয়নি।

অনিশ্চিত উন্নয়নসমূহ

দলিতদের ধর্মীয় জীবনের বহুদিকমুখী বাস্তবতা এবং ঘটমান উন্নয়নগুলো সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। দলিতদের মধ্যে অনেকে তাদের ঐতিহ্যবাহী দেব-দেবীদের পরিত্যাগ ক'রে শিব, বিষ্ণু, পার্বতী ও লক্ষ্মীর ন্যায় সাংস্কৃতিক (Sanskritic) দেব-দেবীদের পূজা করে। তারা আরও চেষ্টা করে নিরামিষভোজনসহ উচ্চ বর্ণগুলোর ধর্মীয় পালনগুলো অনুসরণের। এ প্রসঙ্গে এখানে স্মরণ করতে পারি,

সাতনামিদের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের কথা, সাতনামিরা হচ্ছে, একটি দলিত জনগোষ্ঠী যারা মাংস ও মদ গ্রহণ করে না, বিরত থাকে অশুচি পেশা থেকে, অস্বীকার করে হিন্দু দেব-দেবী, উপাসনা-পদ্ধতি ও শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য। এটা হল, মুক্তিধর্মী লক্ষ্যের জন্য পুরাতন ধর্মীয় পরিচয়ের মধ্য থেকে একটি নতুন ধর্মীয় পরিচয়ের পুনঃরূপদানের বিষয়।

আজকে কিছু কিছু দলিত হিন্দুধর্মে সে সকল ধর্মীয় স্থান পুনঃদাবি করে যেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ দাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শুধুমাত্র মন্দিরে-প্রবেশের বিষয়টি নয় – যা আজ অবধি একটি সর্বজনীন চর্চা হয়ে উঠতে পারেনি – কিন্তু এর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত উপাসনাস্থলগুলোতে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করার দাবি। এই ধারাবাহিকতায় সংগ্রাম প্রচুর প্রতীকি তাৎপর্যের অধিকারী। দলিতদের আরও একটি দল, যারা একদা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা সেবাকার্যে ব্রাহ্মণদের দায়িত্ব পালনকে গভীরভাবে সমর্থন করত, তারা আজকে এ ব্যাপারে অনেক নারাজ আর অনেক জায়গায় তারা এমনকি এর বিরোধিতাও করছে। শিশুজন্ম ও মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত অশুচিতার ব্যাপারে বলা যায়, দলিতরা বিষয়টির খুব কম মনোযোগ দেয়, যখন উচ্চ বর্ণগুলোর নিকট এটা এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

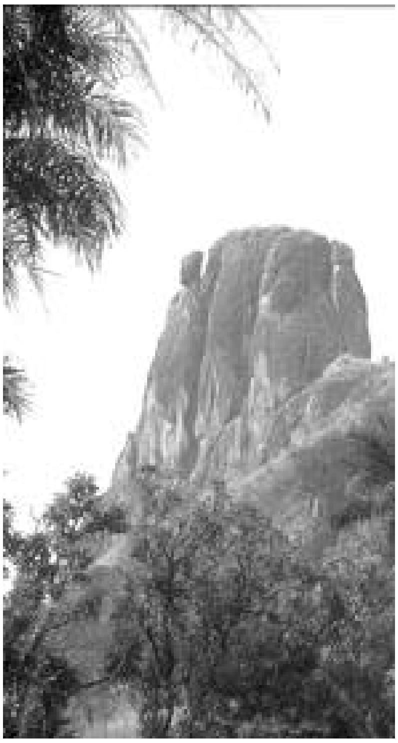

চ্যালেঞ্জের ক্ষমতায়ন

অনেক দলিতদের জন্য যা খুবই ক্ষমতায়তনময় বলে মনে হয়েছে, তা হল, একটি পৃথক ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য তাদের দাবি। তারা হিন্দু পরিচয়ে পরিচিত হতে চায় না, কিন্তু তারা প্রস্তাব করে একটি আলাদা দলিত ধর্মের, যা উচ্চ বর্ণগুলোর সমর্থনপুষ্ট কর্তৃত্বময় হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যকে জেরা করে। সর্বত্র দলিতদের মধ্যে বিতর্কের একটি কেন্দ্রিয় বিষয় হচ্ছে, কর্মে বা পুনঃজন্মে (karmar or rebirth) বিশ্বাস। এই মতবাদই তাদের নিপীড়ন, কষ্টভোগ ও বহিষ্কারের অবস্থাকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছে। এমন দলিতদের দেখা মেলা ভার যারা বিশ্বাস করে যে, তার অবস্থা হচ্ছে পূর্ব কর্মের ফল।

আর্য সমাজের সংস্কারকগণ এবং মহাত্মা গান্ধী নিজে, এর কিছু ধারা সংস্কারের চেষ্টা করার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের মধ্যে দলিতদের জন্য একটি নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। তারা যা করেছিলেন তার মধ্যে একটি হল, দলিতদের হয়ে উচ্চ বর্ণগুলোর নিকট আবেদন জানানো। তারা অনবরত এ দাবি জানিয়ে গিয়েছেন। এ সকল প্রচেষ্টার গভীরে অবস্থিত ভাবনাটি ছিল একটি সংস্কারসাধিত হিন্দু খোয়াড়ে দলিতদেরকে স্থান দেওয়া। তাদের মধ্যে বাল্মিকী পূজা প্রচলনের প্রচেষ্টা ছিল একই ধরনের অপর একটি কৌশল। রামায়ণ রচয়িতা বাল্মিকীকে দলিতদের পূর্বপুরুষ হিসেবে, এমন কি একজন দেবতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তবে, বাল্মিকী পূজাকে ঘিরে সমাবেশ হলেও, বর্ণবাদী হিন্দুদের দ্বারা অনুশীলিত অস্পৃশ্যতার বিলোপ ঘটেনি।

সেই সময়, নিজেদের পক্ষ থেকে দলিতরা ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণগুলোকে শুচিতার অশুচিকরণের প্রথা বাতিল করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, কেননা এ ব্যবস্থা অন্যান্য কিছুর পাশাপাশি হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করা থেকে তাদের (দলিতদের) বাধা দিচ্ছিল। অম্বেদকর নিজেও হিন্দু খোয়াড়ে দলিতদের জন্য একটি সম্মানজনক স্থান খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বর্ণ-প্রথার কঠোর স্তরবিন্যাসের কারণে এটা অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়, তখন তিনি একটি ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলেন। ১৯২০

এর দশকে এবং ১৯৩০ এর দশকে দলিতদের ব্যাপক অগ্রগতিতে, তিনি হিন্দুধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শুচিতা ও অশুচিতা ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে খোদ হিন্দুধর্মের প্রত্যাখানের দিকে এই অবস্থান্তর ছিল সন্দেহাতীতভাবে অম্বেদকরের নেতৃত্বে একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ। অম্বেদকর ও দলিতদের বিরাট একটি অংশ বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে এই প্রত্যাখ্যানকে সমর্থন যোগানোর আগে আরও দু'টি দশক পার হয়েছিল।

এই ধর্মীয় গতিপথ সামাজিক গতিপথে একটি সমান্তরালতা খুঁজে পায়। দলিত আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে, লক্ষ্য ছিল এক সামাজিক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণী অভিমুখে চলন, যার ফলে দলিতরা উচ্চ বর্ণগুলোর প্রথা ও রীতিনীতি গ্রহণ করতে এবং এইভাবে সামাজিক দিক দিয়ে শ্রদ্ধা পেতে সক্ষম হবে। উদাহরণস্বরূপ, তারা গরুর মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে নিরামিষভোজী হবে, কেননা গরুর মাংস খাওয়া হচ্ছে দলিতদের প্রতি বৈষম্যের উৎস। এ ধরনের পদক্ষেপগুলো কেবল বর্ণের প্রতিষ্ঠানকে মজবুত করেছে এবং এর দুর্গে কোন রকম ফাটল ধরাতে পারেনি, তেমনি এটা পারেনি ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে। পরবর্তীতে, এই কার্যক্রমগুলো দলিতরা পরিত্যাগ করেছিল, কেননা এই "সংস্কৃত্যায়ন" (Sanskritization) প্রক্রিয়া যা প্রদান করেছিল তার চেয়ে তারা আরও চরম পদক্ষেপসমূহের কথা ভাবছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অম্বেদকর ধর্মান্তর ভাষণে বলেছিলেন :

"নিজেদেরকে হিন্দু বলে ডাকার দুর্ভাগ্য আছে বলেই, আমাদের সাথে এইভাবে আচরণ করা হয়। আমরা যদি অন্য ধর্মের মানুষ হতাম, তাহলে আমাদের প্রতি এ রকম আচরণ করার সাহস কেউ পেত না। তাই, এমন একটি ধর্ম বেছে নাও ,যা তোমাদের পদমর্যাদা ও আচরণের সম-অধিকার দেবে। আজকে, আমরা আমাদের ভুলগুলো সংশোধন করব। অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক নিয়ে জন্ম গ্রহণ করার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। যাই হোক, এটা আমার দোষ নয়; কিন্তু একজন হিন্দু হয়ে আমি মরব না, কেননা এটা আমার ক্ষমতার মধ্যে।"

এই পদক্ষেপটি অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল না কিন্তু অম্বেদকরের চালিয়ে যাওয়া পূর্বেকার সংগ্রামগুলোর মত একই ছিল। তার নিকট মন্দিরে প্রবেশের জন্য সংগ্রাম প্রধানত দেব বা দেবীর দর্শন পাওয়ার সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত কোন ধর্মীয় বিষয় ছিল না; বরং এটা ছিল একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার একটি বিষয়। কেননা ইস্যুটিতে যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল, এ প্রচলিত ধারণা উন্মোচন করা যে, একজন অস্পৃশ্যের উপস্থিতির কারণে একটি মন্দির কলুষিত হতে পারে, এটা প্রতিষ্ঠিত করা যে, এই উপস্থিতির কারণে কোন দেব-দেবী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

অতি দেরী এবং অতি অল্প

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনের চেষ্টার মাধ্যমে দলিতদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়েছিল, আর হিন্দুধর্মে পুনঃধর্মান্তর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হয়েছিল "শুদ্ধির" ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে। ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যেগুলোর লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্মের এমনভাবে নবায়ন ঘটানো যেন এর সঙ্গে দলিতরা খাপ খাওয়াতে পারে। কিন্তু এটা দলিতদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হতে পারেনি, কেননা তাদের কাছে মনে হয়েছিল, এ নবায়ন আন্দোলনগুলো এখনো বর্ণ ভাবধারার খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, তাদের কাছে মনে হয়েছিল এই উদ্যোগগুলো এখনো ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ী বর্ণদের দ্বারা শাসিত। সম-অধিকার, আন্তভোজ ও স্পর্শ – এগুলো শুদ্ধি অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়ে বেশী দূর যেতে পারেনি। হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের গভীরে স্থিত একটি প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মে দলিতদের ধর্মান্তর।

মহাত্মা গান্ধীসহ সংস্কারকদের চোখে ইস্যুটি ছিল, হিন্দু খোয়াড়ে দলিতদের একত্রিতকরণের। অস্পৃশ্যদের জন্য তাঁর গভীর ভাবনা নিয়ে গান্ধীজী মনে করেছিলেন যে, তিনি তাদের বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। দলিতদের জন্য আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর প্রস্তাবের গান্ধীর দৃঢ়তার সাথে বিরোধিতার নেপথ্যে তাঁর এ দৃঢ় বিশ্বাস কাজ করেছিল যে, তারা হচ্ছে হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর মতে, অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটানোর মত সম্পদ হিন্দুধর্মের আছে। দলিতদের জন্য একটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হবে তাদেরকে

একটি আলাদা সত্তা হিসেবে স্বীকার করা। অম্বেদকর কর্তৃক উত্থাপিত পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবির হুমকিটি ছিল পরিশেষে খোদ হিন্দুধর্মের প্রতি একটি হুমকি। এর অর্থ দলিতদের জন্য একটি স্বাধীন ধর্ম ও রাজনৈতিক পরিচয় গঠন করা। দলিতরা একটি আলাদা ধর্মীয় পরিচয় গঠন করবে, এই একই ভয় অর্থাৎ মন্দিরে প্রবেশের জন্য সংগ্রামের প্রতি গান্ধীসহ অন্যান্য হিন্দু সংস্কারকদের সমর্থনকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সংস্কারকগণ নিজেদেরকে শুধুমাত্র সংস্কারকই প্রমাণ করেছিলেন যখন মন্দিরে প্রবেশের ইস্যুতে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসায় এসেছিলেন। পৃষ্ঠপোষকতাকারী সংস্কারকগণ উচ্চ বর্ণদের অনুভূতিতে আঘাত দিতে চাননি, কেননা এ সকল উচ্চ বর্ণদের মন্দিরে পূজোর সময় অস্পৃশ্যদের সঙ্গে থাকা কঠিন ছিল। তাই, অকপটে প্রস্তাব করা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দলিতদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। এটা অম্বেদকর কর্তৃক ধর্মান্তরণের চূড়ান্ত পদক্ষেপকে সমর্থন ছাড়াও, গান্ধী ও অন্যান্য হিন্দু সংস্কারকগণ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের অপর্যাপ্ততাকে নির্দেশ করে।

যেমনটি সর্বজনবিদিত, দলিতদের সমাজচ্যুত করার প্রধান উৎস হচ্ছে, ধর্মশাস্ত্র ও ঐতিহ্যসমূহ। আমরা এ-ও জানি যে, ধর্মগুলো দ্বিমুখী তলোয়ারের মত। একদিকে এগুলো যেমন লোকদের দাসত্বের জন্য আদর্শগত ও অন্যান্য মাধ্যমের যোগান দেয়, তখন অন্যদিকে এগুলোর আছে মুক্তির উপায়সমূহ। দলিতদের অবস্থার উন্নয়নে ধর্মীয় সম্পদ আহরণে ভারত ব্যর্থ হয়নি। সর্বাপেক্ষা সুবিদিত হচ্ছে, ভক্তি-আন্দোলন যা ঈশ্বরের সামনে সবাই সমান এই সত্যটি মুদ্রাঙ্কিত করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, এ ধরনের অনেক আন্দোলন ধর্মীয় উপায় আহরণ ক'রে নৈতিক বিপ্লবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। তবে, ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, এ জাতীয় ব্যবস্থাসমূহের মাধ্যমে উচ্চ বর্ণগুলোকে শিক্ষা দেওয়া ও তাদের প্ররোচিত করাটা কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পারেনি, কেননা শ্রেণীবিন্যাসের কাঠামোগুলো তখনো অক্ষত ছিল আর সম-অধিকার প্রকাশ বা স্বীকার একটি ধর্মীয় ভাষা বলে পরিগণিত হয়েছে।

এমনকি স্বাধীনতার পরও সংস্কার উদ্যোগগুলো অব্যাহত ছিল। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ জনেরও বেশী হিন্দু মঠ প্রধানদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় কর্ণাটকের উদীপিতে। এ সকল খ্যাতিমান হিন্দু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, হিন্দু ধর্মে অস্পৃশ্যতার কোন স্থান নেই, সকলের উচিত এটা পরিত্যাগ করা। এই নজরকাড়া ও উচ্চনিনাদী সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব বিগত শত শত, হাজার, হাজার বছর ধরে করা পরস্পর সংযুক্ত শত শত ভাল সঙ্কল্প ও প্রস্তাবের একটি ছাড়া কিছুই নয়।

এক নতুন ধর্মীয় পরিচয়

অস্পৃশ্যতার হিন্দুরীতিসিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গতিবেগ পুঞ্জভূত হচ্ছিল, আর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে অম্বেদকর এই গতিবেগকে দান করেছিলেন একটি চরম ও উত্তেজনাময় পরিণতি, যখন তিনি মনুস্মৃতির একটি সংখ্যায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন যা শুচিতা-অশুচিতার পালনকে রীতিসিদ্ধকরণ, আর অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক রচনা করেছিল। একই সময়ে অম্বেদকরের জন্য এবং মাহার সম্প্রদায়ের জন্য বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরণ ছিল একটি মুক্তিকর্ম ও নতুন ক্ষমতায়ন। বিষয়টির গভীর বিশ্লেষণ প্রকাশ করবে যে, অম্বেদকরের নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, দলিতরা প্রকৃতপক্ষে তাদের নিয়তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব ও অনুমোদন প্রত্যাখান করেছিল। ধর্মান্তরণের অর্থ ছিল শুচিতা ও অশুচিতার পীড়নকর নিয়মনীতি থেকে মুক্তি এবং মর্যাদা ও সম-অধিকারের এক নতুন জগতে প্রবেশ। বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরণ দলিতদেরকে যে মানসিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ধর্মান্তরণ তাদের সাহায্য করেছিল হীনমন্যতাবোধকে জয় করতে, আর এটা তাদের মন-মানসিকতায় অহংকার ও আত্মবিশ্বাস বোধ জাগিয়ে তুলেছিল। তবে এ সকল ফলাফল ছাড়াও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের আরও কারণ ছিল। বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরণের সঙ্গে আসা নতুন মর্যাদার সঙ্গে জড়িত ছিল একটি প্রতি-বিশ্বাস। অম্বেদকর অনুমান করেছিলেন যে, মাহারা মূলগত দিক দিয়ে বৌদ্ধ আর এই কারণে তাদের হীনচোখে ও খাটো চোখে দেখা হত। তাই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে ছিল মাহারদের আদি ধর্মে প্রত্যাবর্তন।

নতুন পরিচয়ের (নয়া-বৌদ্ধধর্ম) উল্লেখ বাদ দিয়ে আমরা দলিতদের ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বলতে পারি না। এ কথা সত্য যে, ধর্মান্তরণের ঘটনাটি সামগ্রিকভাবে ঘটেছিল মাহারদের মাঝে, এবং পরে উত্তরপ্রদেশের দলিতদের কয়েকটি গোষ্ঠীর ও অন্যান্য রাজ্যের কিছু বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে। তথাপি এ ধর্মান্তরণের ঘটনাটি দেশের সমগ্র দলিত সমাজের কারণে সার্বিক গুরুত্ব বহন করছিল। কেননা অম্বেদকরের দর্শন অনুসারে, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের আরও যে অর্থ ছিল তা হল ভারতের জন্য–একটি জাতি যে জাতি সম-অধিকার, ন্যায্যতা ও যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত হবে–এক নতুন দর্শন আর এগুলোর সবেরই সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মে।

তবে অম্বেদকর ঠিক সে সংস্করণে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেননি যে সংস্করণে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের ভাবমূলক সমালোচনা গ্রন্থ লিখেছিলেন আর সংঘটিত ব্রহ্মণ্য সংযোজনগুলো পরিশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। এখানে এ ধরনের অন্ততপক্ষে দু'টি সমালোচনা ও পুনঃব্যাখ্যার উল্লেখ করা যেতে পারে। বুদ্ধের কাহিনীতে দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হওয়াকে বুদ্ধের অনাসক্তি ও তাঁর গৃহ ত্যাগের জন্য চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অম্বেদকর অনুসারে, এমন ব্যাখ্যা বুদ্ধের দর্শনের একটি বিকৃতি, যা লক্ষণীয়ভাবে জগত-কেন্দ্রিক, এবং পারলৌকিক নয়। অধিকন্তু অম্বেদকরের সঙ্গে দলিতরাও প্রত্যাখ্যান করেছে বাসনা থেকে জন্ম নেওয়া সকল কষ্টভোগের অনেক বেশী আত্মকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার (একটি ব্রহ্মণ্য বিকৃতি) আর মনোযোগ দিয়েছে বাস্তবধর্মী ঐতিহাসিক লড়াইয়ের মাধ্যমে দরিদ্রতা ও দুর্বিপাক অর্থাৎ দুঃখকষ্টের নিরসনের উপর। "দুঃখবাদের মঙ্গলবাণী", যে অনুসারে দাবি করা হয় বৌদ্ধধর্ম চার পরম সত্যের উপর ভিত্তি করে হতে হবে, একে দলিতরা প্রকৃত সামাজিক মুক্তির একটি বাণীতে রূপান্তরিত করে। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে, কর্মা তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনার অবতারণা ঘটানো হয়েছিল। অম্বেদকর অনুসারে, পূর্ব জন্মের উত্তরাধিকার বলে কিছু নেই, এরই মাধ্যমে তিনি একেবারে গোড়া থেকে বর্ণের ব্যাপকবিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি ছেঁটে ফেলেছেন। সুতরাং, বর্তমান অবস্থা পূর্ব জন্মের কর্মের ফল নয়।

তাদের মুক্তি ও ক্ষমতায়নে বৌদ্ধ ধর্মীয় পরিচয় এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, কোন কোন দলিত নিজেদেরকে দলিত হিসেবে নয় কিন্তু বৌদ্ধ হিসেবে পরিচয় দান করে, কেননা তাদের মতে দলিত পরিচয়ের সঙ্গে এখনো জড়িত আছে অবমাননাকর গূঢ়ার্থ, যা তাদের অস্পৃশ্য অতীত স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রবণতা প্রকাশ পায় মহারাষ্ট্রের দলিতদের মাঝে। বৌদ্ধধর্ম ও দলিতদের নিয়ে এ আলোচনা ও আলোকপাতগুলো নির্দেশ করে যে, এই সম্পর্কের অনেকগুলো দিক রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম দলিতদের পরিচয়-গঠনের একটি নতুন মানদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে, এটা হচ্ছে তাদের অহংবোধ ও মুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং একটি রাজনৈতিক আন্দোলন যার লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দুধর্মের পক্ষপাতমূলক বিশ্বাসগুলো চ্যালেঞ্জ জানানো, যে ধর্ম থেকে তাদের মতে মুক্তি অর্জন করেছে বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরের মাধ্যমে।

দলিত ও ইসলাম

ভারতে ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে দেখব যে, দক্ষিণ ভারতে ইসলামী উপস্থিতি বণিক ও সুফিদের কাজের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল, আর দেশের উত্তরে এর প্রসার ঘটেছিল প্রধানত রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে। খ্রীষ্টধর্মের মতই, এর বাণী প্রচারে, ঈশ্বরের সামনে সকল মানুষের সম-অধিকারের কথা ইসলামও প্রচার করে। এই প্রচারণা দলিতদের আকৃষ্ট করে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য শুধুমাত্র তাঁতী ও মুচিরা এই সুযোগ গ্রহণ করেছিল। তবে, আমরা যদি মুসলিম সমাজের গঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমরা দেখব যে, খুব কম সংখ্যক দলিতই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। মুসলিম সমাজ এদের নিয়ে গঠিত ছিল : নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা, শাসক শ্রেণীগুলোর অধীনে বন্দীদশার লোকেরা, গ্রাম্য মাতব্বর, কর আদায়কারী ও এই রকম আরও অনেকে, মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল কারিগররা, এবং মুসলিমদের অধীনে থাকা ক্রীতদাসদের ছেলেমেয়েরা। এ সকল ধর্মান্তরণের ঘটনা ছিল খুবই সীমিত তবে এর ছিল উচ্চ প্রতীকী গুরুত্ব। গ্রামীণ অবকাঠামোয় উচ্চ ও

মধ্যবিত্ত বর্ণগুলোর সুদীর্ঘ নিপীড়নের জবাব হিসেবে এ ঘটনাগুলো ঘটেছিল।

একটি মৌলিক বিষয়

দলিতদের ধর্ম পরিবর্তনকে ঘিরে বিতর্ক অনেকের মনকে নাড়া দিলে, আর এ ঘটনা গুরুতর তর্ক-বিতর্কের কারণ হলে, একটি অধিকতর মৌলিক বিষয় উঠে এসেছিল। আর বিষয়টি হচ্ছে, দলিতদের খোদ ধর্মীয় পরিচয়। ধর্মপরিবর্তনকে ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল এ ধারণার উপর ভিত্তি করে যে, দলিতরা হিন্দু। তবে কিছু দলিত জনগোষ্ঠী ও বহিরাগত এ দাবির বিরোধিতা করেছিল। মুসলিম লীগ যখন ১৯০৯-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মোর্লে-মিন্টো সংস্কার চলাকালীন সময়ে বিধান-পরিষদগুলোতে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবি তুলেছিল, তখন যে সব বিষয় উত্থাপন করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, হিন্দুরা "অবমানিত জাতিগুলোকে" অর্থাৎ তফসিলি জাতিদের তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে। অধিকন্তু, যখন অম্বেদকর অস্পৃশ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষেত্রে এবং মন্দিরে প্রবেশের ও অভিন্ন জলাধার থেকে জল সংগ্রহের অধিকারের জন্য সংগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন, তখন পাঞ্জাবে আর একটি ধর্মীয় আন্দোলন ঘটে যায়। মঙ্গু রাম নামের এক দলিত নেতা এ ভূমিকা দিয়ে শুরু করেন যে, কথিত অস্পৃশ্যরা হচ্ছে দেশের আদি বাসিন্দা আর কালের প্রবাহে অন্যরা তাদেরকে প্রান্তসীমার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই বিশ্বাস থেকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি স্বতন্ত্র দলিত ধর্মীয় আন্দোলন যার নাম হচ্ছে 'আদি ধর্ম" (Adi Dharm)। নিকট দশকগুলোতে, অনেক দলিত তাদের ধর্মীয় পরিচয়কে ব্যাখ্যা করেছে এমনকিছু হিসেবে যা হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা। এই উপলব্ধিই তাদের অনুপ্রাণিত করেছে তাদের 'দলিত ধর্ম' বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে, যার মধ্যে তারা তাদের ক্ষমতায়নের একটি নতুন উৎস খুঁজে পায়।

উপসংহার

ভারতীয় দলিতরা দরিদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র। এটাই যথেষ্ট কারণ যে মার্ক্সবাদ, দরিদ্রতা ও শোষণের উপর এর অতিশয় গুরুত্বারোপের দরুণ দলিতদের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু ঘটনা আসলে তা নয়। দরিদ্র হলেও, দলিতরা তাদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন ও তাদের অবমাননার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল, যা এসেছিল বর্ণ প্রথা এবং হিন্দু ঐতিহ্য/ধর্ম কর্তৃক এর আইনসম্মতকরণ থেকে । তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সফলতা বর্ণ ও ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের সফলতার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। এমনকি অম্বেদকর, যিনি তার প্রথমদিককার বছরগুলোতে মার্ক্সবাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন, তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দলিতদের মুক্তি ও ক্ষমতায়নকে স্বীকার করে নিতে হবে ধর্মীয় জগতকে, এর ক্রিয়ানুষ্ঠান ও মতাদর্শকে; একে ধর্মের গভীরে দৃঢ় বদ্ধমূল হওয়া বর্ণ বিষয়কে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে।

অম্বেদকরের ন্যায়, দলিতদের নিকট ধর্মে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাস্তবতার অথবা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের খুব একটা সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক দার্শনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নয়; ধর্মের নিকট মুখ্য হচ্ছে নীতি, অর্থাৎ একটি জীবনধারা যা রূপান্তরকে উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই সন্দেহ নেই যে, Dhamma অর্থাৎ নৈতিকতার উপর এর গুরুত্বারোপের কারণে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অম্বেদকরের ছিল গভীর আকর্ষণ আর এই কথা প্রযোজ্য দলিতদের একটি বৃহৎ অংশের ক্ষেত্রে। হিন্দু ধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ ছিল নৈতিকতার দিক দিয়ে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার মর্যাদার স্থল–এই মর্যাদা হচ্ছে, এমনকিছু যা দলিতরা মনে করে ঐতিহ্যবাহী হিন্দু ধর্মে তারা লাভ করতে পারেনি। গুরুত্বপূর্ণ হল, দলিতরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের স্বাধীনতা ও প্রতিনিধিত্ব অনুশীলন করার, তাদের উপর চাপিয়ে-দেওয়া ধর্মীয় মতবাদের বিরোধিতা করার। ধর্ম যা-ই হোক, তারা খোঁজ করে মর্যাদার ও ন্যায্যতার, তারা নিজেদেরকে তুলে ধরেছে দাসত্বে পরিণতকারী প্রতীক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চরম সমালোচক হিসেবে। দলিতরা যে কাজটি করেছে তা হচ্ছে, মুক্তি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যের উদ্দেশে ধর্মকে পুনঃগঠন করা।